ঈশ্বর-তত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত পল কেরস পিএচ, ডি,

প্রণীত।
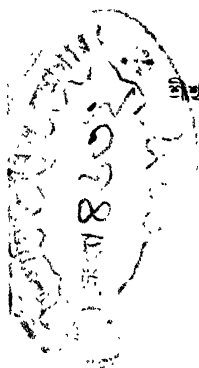
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা

সমুন্নত-সাহিত্য প্রচারী কোং কর্ত্তৃক

১২৭ নং মসজীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে

প্রকাশিত।

সন ১২৯৭ সাল।

বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বর-তত্ত্ব নামক এই প্রবন্ধটি ইংরাজী "Idea of God," নামক প্রবন্ধ হইতে অনুবাদিত। প্রবন্ধটি বহুদর্শী দার্শনিক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পল্ কেরস্ কর্ত্তৃক রচিত ও ইংরাজি ১৮৮৮ সালে আমেরিকা চিকাগো নগরে নীতিবিজ্ঞান উদ্দীপনী সভায় পঠিত হয়। প্রবন্ধটি সারগর্ভ প্রবন্ধ। প্রবন্ধ-রচয়িতা এই প্রবন্ধে স্বীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কোন একটি মতের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রবন্ধটি রচনা করেন নাই। স্বাধীন চিন্তা মনুষ্যের জ্ঞানকে যত দূর লইয়া যাইতে পারে, যত দূর বিশ্বাস করাইতে পারে, তিনি এই প্রবন্ধে তাহাই বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধটি ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে কল্পনার প্রকৃতি, দ্বিতীয় বিভাগে ঈশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি, তৃতীয় বিভাগে ঈশ্বরের অনন্বিত-কল্পনা-স্বরূপত্ব, চতুর্থ বিভাগে ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্যের ধারণা, পঞ্চম বিভাগে ঈশ্বর-কল্পনার লক্ষণ ও ষষ্ঠ বিভাগে ঈশ্বর সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নিজের মত প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রবন্ধরচয়িতার মতটি নাস্তিকতা ও আস্তিকতার মধ্যবর্ত্তী একটি নবোদ্ভাবিত মত বলিলেও অসঙ্গতোক্তি হয় না। যদিও ঐ সকল মতই খণ্ড খণ্ড ভাবে আর্য্যশাস্ত্রেও দেখা যায় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান আকারে গঠনপ্রণালী তাঁহার নিজেরই; কাহারও অনুকরণ নহে। প্রবন্ধকর্ত্তা নাস্তিকের ন্যায় স্বভাবকর্ত্তৃত্ববাদীও নহেন, এবং আস্তিকের ন্যায় প্রকৃতির অতীত পুরুষের অস্তি-

ত্বেও বিশ্বাস করেন না। প্রবন্ধরচয়িতার মতে ঈশ্বর মানবের শূন্যকল্পনা নহে, কিন্তু সত্যকল্পনা। তিনি বলেন, ঈশ্বর-কল্পনাকে যদি শূন্যকল্পনা বলিতে হয়, ঈশ্বরকল্পনার মূলে যদি কিছু মাত্র সত্য না থাকে, তবে এই সংসারের সর্ব্ববিধ কল্পনাই অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যখন অপরাপর কল্পনার সত্যত্ব স্বীকৃত হইতেছে, তখন ঈশ্বর-কল্পনার সত্যত্বই বা স্বীকৃত না হইবে কেন? ঈশ্বর জড়প্রকৃতির নৈতিক জীবন স্বরূপ। মানব তাদৃশ ঈশ্বরকেই আদর্শ করিয়া নিজের উন্নতি সাধন করেন। ঐ আদর্শ যদি শূন্যকল্পনা হয়, তবে মানবের উন্নতির ইচ্ছাও মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফল হয়। তবে ঐ ঈশ্বর পুরুষ বা স্ত্রীও নহেন; কিন্তু তিনি পুরুষের পুরুষত্ব ও স্ত্রীর স্ত্রীত্ব। এক কথায় ঈশ্বর প্রকৃতির সার বা জীবন। ঈশ্বর আমাদিগের উন্নতির একমাত্র আশ্রয় হইয়াও আমাদিগের ন্যায় উপাসনাপ্রিয় পুরুষবিশেষ নহেন। ঈশ্বর প্রকৃতির নিয়ম স্বরূপ। যিনি ঐ নিয়মের অবিরোধে—ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তনে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করেন, তিনিই উন্নতি লাভ করেন, আর যিনি তাহার বিপরীত আচরণ করেন, তিনিই অধঃপতিত হয়েন। ফলতঃ, প্রকৃতির নিয়ম পরিপালনেই জীবের উন্নতি।

সম্পাদক।

ঈশ্বর-তত্ত্ব।

ঈশ্বর কি, সৃষ্টিকালাবধি এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে মানবসংসারে অবিরাম আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতের পুরাকালীন মহাপুরুষেরা এই নিগূঢ় পরম তত্ত্বের যতদূর সূক্ষ্ম গবেষণা করিয়াছেন, বোধ হয়, জগতের অপর কোন খণ্ডের পণ্ডিতেরা তত দূর করেন নাই। অধুনা পাশ্চাত্য সংসারে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরমার্থ বিজ্ঞানের মৌলিক আলোচনা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতেরা ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণে নানা যুক্তির আবিষ্কার করিতেছেন। তত্ত্বটি এত অন্ধকার ও জটিল যে, কোনক্রমেই মতভেদ বিভঞ্জন হইতেছে না। যতই মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধি হইতেছে, যতই মানসিক বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যতই যুক্তিবিচার পরিপক্ক ও

মার্জ্জিত হইয়া উঠিতেছে, ঈশ্বর-তত্ত্বের মীমাংসার দিন দিন ততই নূতন নূতন বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর কেবল মানসিক কল্পনা মাত্র। স্মৃতি-বহির্ভূত অতীতকালে মনুষ্যের মনে যত প্রকার কল্পনার উদয় হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানকল্পনাই [১] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গভীরভাবে পরিপূর্ণ। মানসিক ভাব ও চিন্তা, এই দুটিই

---

১ এই স্থলে 'কল্পনা' শব্দের অর্থ মিথ্যা-জ্ঞান নহে ; কিন্তু সত্য-জ্ঞান। 'কল্পনা' শব্দের কেবল মিথ্যা-জ্ঞান এই অর্থ হইলে, বেদশাস্ত্রে ("যথাপূর্ব্বমকল্পয়-দ্দিবঞ্চ পৃথিবীমিত্যাদি' [সামবেদ]।) ঈশ্বর এই বিশ্বসংসারের কল্পনা করিলেন, এইরূপ প্রয়োগ হইত না। বিশ্ব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের সত্য কল্পনা। সুতরাং, ঈশ্বর সঙ্কল্পমাত্রে এই সত্য বিশ্বের উৎপাদন করিলেন, এইরূপই অর্থ করিতে হইবে।

তদ্রূপ এই স্থলে 'কল্পনা' শব্দেস ত্য-জ্ঞানকেই বুঝিতে হইবে তবে যে সকল ভাব পদার্থের কোন পরিদৃশ্যমান আকার নাই, তাহাদিগকেই দার্শনিকগণ 'কল্পনা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। কল্পনাশক্তি ও চিন্তা-শক্তির বিরহে মনুষ্য নিশ্চয়ই পশুতুল্য। কল্পনা ও চিন্তার একতায় জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞান দুই প্রকার;—প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ;—সাকার ও নিরাকার। ব্রহ্মজ্ঞানের কল্পনা অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। যাহার উদ্বোধন মানসে হয়, বাহিরে প্রকাশ পায় না, তাহাই অপ্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান। যে সকল সাকার বস্তু সচরাচর আমাদিগের অক্ষি-গোচর হয়, তাহাই প্রত্যক্ষীভূত ভৌতিক জ্ঞান। যেমন বৃক্ষ, লতা, আসন, কুক্কুর ইত্যাদি। ঈশ্বর, এ জ্ঞানের গোচরীভূত নহেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর কল্পনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের কল্পনা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। অতএব ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণে বিভিন্ন বিভিন্ন নানাপ্রকার মত সৃষ্টি হইয়াছে।

একজন ধর্ম্মযাজক এবং একজন ব্যবহারাজীব একদা ঈশ্বরের প্রকৃতি পরিলক্ষণে ঘোরতর বিবাদ উত্থাপন করেন। ধর্ম্মযাজক বলেন, ঈশ্বর আছেন; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুপ্রণালী এবং সৃষ্টিকৌশলের চমৎ-

কারিত্ব প্রদর্শনে তাহা তিনি সপ্রমাণ করিতে পারেন, এরূপ অঙ্গীকার করেন; উকীল বলেন ঈশ্বর নাই; তাদৃশ কল্পনার অযৌক্তিকতা দেখাইয়া তিনিও আত্মবাক্য সমর্থনে প্রতিশ্রুত হন। তাঁহার মতে সাকার ঈশ্বরসত্তা অসম্ভব এবং আত্ম-বিরোধী। একজন সওদাগর তাঁহাদিগের উভয়ের বাদানুবাদ শ্রবণ করিতেছিলেন, তাঁহার উপরেই মীমাংসার মধ্যস্থতার ভার পড়ে। ঐ যাজক এবং উকীল, উভয়েই উক্ত সওদাগরের শ্রেষ্ঠ প্রতি-পোষক;—অন্যান্য সময়ে ঐ সওদাগর পরোক্ষে উভয়ের মতেই অনুমোদন করিতেন; একের অসাক্ষাতে অপরের সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া সায় দিতেন;—এবারে তিনি বড় বিপাকে ঠেকিলেন। পাছে উভয়ের মধ্যে অন্যতরের সহায়তা হারাইতে হয়, এই আশঙ্কায় অবশেষে তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, "আমি বলি, বাস্তবিক সত্য-তত্ত্ব মধ্যস্থলে নিহিত।"

বোধ হয়, এই ব্যক্তির কথাই যথার্থ। বাস্ত-

বিক সত্য-তত্ত্ব মধ্যস্থলে নিহিত। কিন্তু হাঁ—না, এই উভয়ের মধ্যস্থ কোথায়, উচ্চনিম্ন ভাগহারের সহজ গণনায় তাহা নির্ণয় করা যায় না, কেবল এই মাত্র কষ্টকর ব্যাপার। যদি আমরা এমন জানিতে পারি যে, যথার্থই হাঁ—না, উভয়ের মধ্যস্থলে সত্য নিহিত আছে, তাহা হইলে ইহার মীমাংসার নূতন প্রশ্নসূত্র আকৃষ্ট হয়, যথা—কোন্ ভাবে ঈশ্বর আছেন, কোন্ ভাবে ঈশ্বর নাই?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়াসে আমরা সত্যপথ অতিক্রম করিব না। উভয় পক্ষের অন্যতরের মতপোষণ করাও আমাদের অভিপ্রেত নহে, মূলপ্রশ্নের তলস্পর্শ করাই আমাদের চেষ্টা। কেবল মূলতত্ত্বের পূর্ণতা পর্য্যালোচনাতেই ইহার মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এই রূপ অনুমান করিতে পারা যায়। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে মীমাংসক মধ্যস্থ স্বরূপে আমাদিগকে দণ্ডায়মান হইতে হইতেছে; কিন্তু অন্যতর কোন পক্ষকে আমরা সন্তোষ প্রদান করিতে পারিব,

এরূপ আশা অতি অল্প, কেন-না, একান্ত সম্ভবতঃ আমাদের সিদ্ধান্ত আসিবে, উভয় পক্ষই বিভ্রান্ত।

ব্রহ্মকল্পনার ইতিহাস অতি প্রাচীন কালের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে বিলীন হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের লক্ষণে জানা যায়, যাহা মহৎ ও সমুচ্চ, যাহা গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, তাহাই ব্রহ্মকল্পনায় সন্নিবেশিত ছিল, আরও, সেই সঙ্গে সাধারণ দুষ্ক্রিয়া ও অবিচার স্রোতে প্রবহনেরও একটী ব্যপদেশস্বরূপ হইয়াছিল। প্লেটো এবং আরিষ্টটলের দর্শন শাস্ত্রের কেন্দ্রপ্রস্তরই ব্রহ্মকল্পনা। সর্ব্বকার্য্যেই ঈশ্বরবাক্য অধিদেবতাস্বরূপ ছিল। যোধবীরগণ রণহুহুঙ্কারে এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন, ধর্ম্মার্থ জীবনবিসর্জ্জনকারিরা এই বাক্য কণ্ঠাগ্রে রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিতেন, কোটি কোটি লোকে দুঃখবিপদে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া মানসিক সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইত। তাহারা সকলেই বিবেচনা করিত যে, ঈশ্বর একজন সর্ব্বপ্রধান

মহাপুরুষ, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অথবা আমাদের ভাগ্যসংসারের সর্ব্বহিতৈষী দয়াময় প্রভু।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কল্পনা দুই প্রকার;—প্রত্যক্ষ কল্পনা এবং অপ্রত্যক্ষ কল্পনা।—যাহা ইন্দ্রিয়-গোচর, তাহাই সাকার, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, তাহাই নিরাকার।—অপ্রত্যক্ষ কল্পনা ক্রম বিকাশের ফল। শুভ্রতা, উত্তমতা, সাহস, গুণ, এগুলি অপ্রত্যক্ষ কল্পনা। আমরা তুষারের শুভ্রতা অবলোকন করি, কমলের শুভ্রতা নয়নগোচর করি, এই প্রকার নানাবিধ শুভ্র বস্তু আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। লোহিতবর্ণ পদার্থ সর্ব্বদাই আমাদের অক্ষিগোচর হয়, কোন লোহিত পদার্থ আমাদের নেত্রপথে পতিত হইবামাত্রই আমরা তাহা লোহিত বলিয়া চিনিতে পারি। শরীরের শোণিত, প্রভাতের আরক্ত অরুণাভা, লোহিতবর্ণ গোলাপ ফুল ইত্যাদি দর্শন করিয়া আমরা রক্তবর্ণ পরিচয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি; সেই জ্ঞানে আমাদের মানসের নির-

পেক্ষ বোধ-শক্তি জন্মিয়াছে, নিশ্চয়ই আমাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক রন্ধ্র বিশেষে সেই বোধ-শক্তির অবস্থান, যতবার আমরা চক্ষুগোচরে লোহিত পদার্থ দেখিতে পাই, ততবারই সেই রন্ধ্রে, সেই শক্তি সঞ্চারিত হইয়া সেই জ্ঞানের উপলব্ধি হয় [২]।

পুরাকালীন লোকেরা অপ্রত্যক্ষ কল্পনাকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। গ্রীকেরা গুণ অথবা পুণ্যশব্দে গুণবতী সুন্দরী স্ত্রী বুঝিয়া লইতেন। ইংরাজী ভাষাতে এক্ষণে সে প্রকার

---

২ জ্ঞান মাত্রই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু এতদুভয়ের শক্তি-প্রকাশের ফল। জ্ঞাতা, বাহ্যবস্তুর রূপাদি-শক্তির স্ফুরণ হইতে উদ্বোধিত স্বকীয় জ্ঞান-শক্তির সাহয্যে সর্ব্ববিধ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। ঐ জ্ঞান বাহ্যবস্তুবিষয়ক হইলেও রূপাদি গুণ সকলের সহিত অনন্বিত অস্তিত্ব-জ্ঞান বা অনন্বিত রূপাদি গুণজ্ঞান সকল জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির স্ফুরণের বোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। রূপাদি বিশিষ্ট বস্তু সকল আকার বিশিষ্ট হইলেও উহা দ্বারা রূপাদি বিষয় সকলের বিশেষ কোনা আকার ব্যক্ত হইতে পারে না। ফলতঃ নিরাকার ভাব সকলের জ্ঞান আমাদিগের

শৈশব-সংস্কার পরিহার করা হইয়াছে। ব্রহ্ম-কল্পনা কি, ইহাতে যদি কিছু বুঝিবার থাকে, তাহা নিশ্চয়ই অপ্রত্যক্ষ কল্পনা, প্রত্যক্ষ পদার্থ কল্পনা নহে। মানবজাতির জ্ঞানবিকাশের প্রথম অবস্থায় মনুষ্যেরা মনঃকল্পিত ঈশ্বরকে সাকার কল্পনা করিয়া, সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ, বিশ্বসংসারের সৃজনকর্ত্তা, নিয়মকর্ত্তা, এবং পাপপুণ্যের বিচার-কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ইহা কি অনৈসর্গিক বলা যাইতে পারে? পাপপুণ্যের মূর্ত্তিকল্পনা যেমন

জ্ঞান-শক্তির প্রসারণ মাত্র। একথা পঞ্চদশীকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটং।
তত্রাজ্ঞানং ধিয় নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥"

বুদ্ধি ও বুদ্ধিস্থ চিদাভাস উভয় এককালেই ইন্দ্রিয় প্রণালী দ্বারা বাহ্যবিষয়কে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বুদ্ধি কর্ত্তৃক বাহ্যবস্তুবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ হইলেই চিদাভাস হইতে বাহ্যবস্তুর স্ফূর্ত্তি হয়; অর্থাৎ প্রথমতঃ বুদ্ধি স্বয়ং বাহ্যবস্তুর আকারে আকারিত হইয়া কল্পিত হইবে। তদনন্তর তদ্বিষয়ক ধারণা হইতে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আবশ্যক ছিল, ঈশ্বরের মূর্ত্তিকল্পনাও সেইরূপ আবশ্যকতা প্রতিপাদক।—কল্পনায় যাহা আইসে, তাহাই প্রকৃত পদার্থ এই প্রাচীন সংস্কার কেবল কয়েক শতাব্দী মাত্র দর্শনশাস্ত্র হইতে তিরোহিত হইয়াছে, এরূপ স্থলে আজিও ঈশ্বরের সাকারত্ববাদ বিদূরিত হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বে সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হওয়া অবশ্যই সময় সাপেক্ষ; কিন্তু উহা তিরোহিত হইবেই হইবে, ইহা নিশ্চয়; আমরা যেমন এখন প্রাচীন কালের দেবদেবী-উপাসনা, জ্ঞান, পুণ্য ও সৌন্দর্য্যের অকপট বিশ্বাস স্মরণ করিয়া হাস্য করিতেছি, আমাদের পরবংশীয়েরাও আমাদের এখনকার ধর্ম্মভাবে পৌত্তলিকতা প্রসঙ্গে এইরূপে হাস্য করিবে সন্দেহ নাই।

পুরাকালীন লোকেরা যে, যথার্থই ধর্ম্মভাবে তাদৃশ দেবদেবীর প্রকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখিতেন, তদ্বিষয়ে আমরা কোন অংশে সংশয় রাখিতে পারি না; যাঁহারা এখন আধুনিক ধর্ম্ম-তত্ত্বের

গবেষণার মানসে ঐ প্রকার আধ্যাত্মিক ভাবের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন, তাঁহারা পোলাণ্ড অথবা আয়ারলণ্ডের প্রত্যন্তবাসী কোন অচলা ভক্তিসম্পন্ন কাথলিক্ সাধকের ধর্ম্মভাব আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ভক্তের হৃদয়ে নিঃসংশয় অটল বিশ্বাস যে, স্বর্গীয় দূত এবং সিদ্ধ পুরুষেরা তাঁহার মস্তকোপরি বায়ুপথে কোন-না-কোন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন।

অধিক কথা কি, বর্ত্তমান সময়ের অনেক শিক্ষিত লোকেরও বিশ্বাস এইরূপ যে, অনুমেয় ভাব সকলেরও মূর্ত্তি আছে, এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা সময়ে সময়ে সেই সকল মূর্ত্তির সহিত সহজেই কথা বার্ত্তা কহিতে পারেন। অল্প দিন হইল, আমি একজন সুশিক্ষিত মারকিণ পাদ্রির নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, দেবতা, পিশাচ, স্বর্গদূত, এবং মতবৈরী অশুভ গ্রহে তিনি বিশ্বাস রাখেন। প্রাচীনকালের লোকেরা যে, তাঁহাদের পৌরাণিক দেবদেবীতে অকৃত্রিম বিশ্বাস

রাখিতেন, এতাদৃশ সমুজ্জ্বলপ্রমাণ বিদ্যমানে কোন ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ করিতে পারেন ?

মতসংস্কারের প্রথম প্রস্তাবনায় পণ্ডিতগণের মধ্যে এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল যে, কল্পনায় যাহা আইসে, তাহা বাস্তবিক কোন বস্তু কিম্বা শুদ্ধ কেবল নাম মাত্র ?—কল্পনার কোন লক্ষ্য বস্তু আছে, তাহার প্রকৃত সত্তা বিদ্যমান, এই মত যাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুকূলেই সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। নামবাদীরা, যাঁহারা কল্পনাকে কেবল নামমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা পরাভূত ও উৎপীড়িত হইয়া যাক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সেই মত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া এক অভিনব দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হয় ;—অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহা শোধিত বিশোধিত হইয়া প্রবল হইয়া উঠে। সেই দর্শনকার সর্ব্বকালীক প্রধান চিন্তাশীল ইমানিউয়েল কাণ্ট।

“বিশুদ্ধ যুক্তিবিচার” নামে কাণ্ট একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা

করেন, আমাদের আনুমানিক জ্ঞান কেবল বস্তু বিশেষের প্রতিরূপ, আমাদের কল্পনা কেবল মানসিক চিন্তা। সচরাচর আমরা যে ভাবে প্রকৃত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করি, আনুমানিক জ্ঞানে সে ভাবের নিশ্চিতত্ব উপলব্ধি হয় না;—তাহা বাস্তবিক কল্পনার উদ্বোধন। প্রকৃতবাদ সম্বন্ধে কাণ্ট বলেন, "মানসিক উদ্বোধন ব্যতিরেকে আমরা কোন বিষয়ের প্রকৃতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না;—এক উদ্বোধন হইতে বহুদর্শনের ক্রমপর্য্যায়ে সম্ভরত অপর উদ্বোধনের আবির্ভাবেই প্রকৃত বস্তুর জ্ঞানোদয় হয়। কোন প্রকার অদ্ভুতদর্শন কেবল উদ্বোধনের প্রতিরূপ; উদ্বোধনেই অলৌকিক অদ্ভুত-দর্শন অনুভূত হইয়া থাকে। উদ্বোধন বাস্তবিক আর কিছুই নহে, পুনঃ পুনঃ দর্শনে ক্রমশঃ জ্ঞানবিকাশেই উদ্বোধনের উদয়, এবং তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্ভুত-দর্শন। উদ্বোধনের অগ্রে অদ্ভুত-দর্শনকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা, ইহাতে বুঝায় এই যে, হয় ক্রমশঃ

বহুদর্শনে জ্ঞানোন্নতির গতি, অথবা উহা কিছুই নহে।

অদ্ভুত-দর্শনের ন্যায় বহুদর্শনবলে কখনও কি আমরা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিতে পারিব? কস্মিন্ কালেও না। কাণ্টের মতে ঈশ্বর অদ্ভুত-দর্শন নহেন, উহা কেবল চিন্তার বিষয়,—উহা কল্পনা,—এবং নিঃসন্দেহ আধ্যাত্মিক কল্পনা। কাণ্ট নির্ভয়ে নামবাদের এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—তিনি সগৌরবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কল্পনা মাত্রেই কেবল নাম, এবং ঈশ্বর শব্দটী অবশ্যই নামবোধক,—চিন্তার ধারণা, —মানসিক চিন্তার পরিণাম।[৩]

---

৩ যথার্থই বিশুদ্ধ যুক্তি। এই তত্ত্ব অবগত হইয়াই আর্য্য-ঋষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে ঈশ্বরের নাম দিয়াছেন, "চিন্তামণি।"—হিন্দুদর্শন শাস্ত্রে ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক আখ্যা, "মনোময়,—জ্ঞানময়।"—প্রশস্ত অর্থে নামই ব্রহ্ম।—অনুবাদক।

ঈশ্বর নাস্তি, কাণ্ট কি এমন কথা বলিয়াছেন ? না,—কিছুতেই না। তিনি কেবল যুক্তি অবলম্বনে এইটুকু সপ্রমাণ করিয়াছেন,—সে প্রমাণে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—ঈশ্বর শুদ্ধ চিন্তাগোচর ;—এমন কি, আদিম পরমার্থ শাস্ত্রেরও এই মত গ্রাহ্য। কিন্তু "ব্যবহারিক যুক্তিবিচার" গ্রন্থে তিনি প্রসঙ্গাধীনে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "ঈশ্বর যে, চিন্তার উদ্বোধন, ইহা আমরা কার্য্যগতিকে অবশ্যই অনুভব করিতে পারি ;—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যাইতে পারে না, কিন্তু ব্যবহারিক যুক্তিতে বিনা প্রমাণেও ব্রহ্মকল্পনা সিদ্ধ হয়।

কাণ্টের মতে পূর্ণতায় ব্রহ্মকল্পনাতত্ত্ব সমুচ্চ সীমা স্পর্শ করিয়াছে। বহুদিন হইল, এ বিষয়ে মত বিরোধের সংগ্রাম নিবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু বিষয়টী এতদূর বিজটিল যে, কাণ্টের পর শতবর্ষ গত হইয়া গেল, আজি পর্য্যন্ত উহা সাধারণতঃ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় নাই। অদূরদর্শী দার্শ-

নিকেরা অন্ধকারে যুদ্ধ করিতেছেন; এক পক্ষে উগ্র প্রকৃতি প্রতিমাভঞ্জকেরা, অন্য পক্ষে অভিনব গোঁড়া খ্রীষ্টানআখ্যাধারী অকপট দেবপূজকেরা। উভয় পক্ষই কল্পনার প্রকৃত প্রকৃতি নির্ণয়ে অজ্ঞানতার নিবিড় কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন;—বোধ হয়, এক সময় সমুজ্জ্বল প্রভাতের প্রখর সূর্য্যকিরণ প্রভাবে সেই কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হইয়া যাইবে; তখন তাঁহারা দেখিবেন, কেবল একটী শব্দমাত্র লইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিতেছেন; এবং শুদ্ধ সেই নামের কলহে বাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া রহিয়াছেন।

কল্পনায় যাহা যাহা উদিত হয়, তৎসমস্তই যে, প্রকৃত পদার্থের প্রতিরূপ, এমন কখনই নহে। অনেক কল্পনাই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অমূলক, অনেক কল্পনাই মানুষের মনে স্বপ্নবৎ ভ্রান্তিবোধক। তাদৃশ ভ্রান্তিতে নানা সময়ে নানা অশুভ ফল সমুৎপন্ন হয়। আমাদের কার্য্য, আমাদের বাক্য, এবং আমাদের চিন্তা, সমস্তই ভালমন্দ ফলাফল

প্রসব করে ;—যাহা, ভাল তাহা স্থায়ী হয়, তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে মনুষ্যত্বের মঙ্গল বর্দ্ধন হয় এবং যাহা, মন্দ তাহা ক্রমশঃই বিলোপদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল কল্পনা ভ্রান্তিমূলক, তাহা দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট সংসাধিত হয়। আমাদের মনের ভ্রম, শরীরের ব্যাধি অপেক্ষাও অহিতজনক। মার্কুস্ অরিলিয়স বলিয়াছেন, "নেবা রোগীর পিত্ত এবং কুক্কুর-দংশিত ব্যক্তির শরীরস্থ বিষ অপেক্ষা ভ্রান্ত-সংস্কারের পরাক্রম কোন অংশে অল্প, এমন কি তোমরা বিবেচনা কর ?"

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-কল্পনার স্বরূপ অবধারণে আমরা প্রয়াস পাইব। বাস্তবিক ব্রহ্মকল্পনা কি ? উহা কি প্রকৃত, কিম্বা মনুষ্য-মানসের ভ্রান্তি মূলক মোহ, তাহাই আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

ঈশ্বর-কল্পনা, এত বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপন বোধ-সিদ্ধ

এক এক প্রকার স্বতন্ত্র অনুভব। কোথাও দুই পদার্থ সমান নাই, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মতে ব্রহ্ম-কল্পনা তাহাদের আপন আপন প্রকৃতির অনুযায়ী, কারণ, প্রত্যেকেই আপন প্রতিরূপ অনুসারে আপন আপন ঈশ্বর গঠন করিয়া লইয়াছে।

রাজকুমার ইউজিনের অধীনে অষ্ট্রিয় সেনাদলে একজন নির্ভীক সেনা-নায়ক ছিলেন। একদিন তাঁহার সমক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ক তর্ক উপস্থিত হইলে, তিনি আপন তরবারি স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহোদয়গণ! আমি ঈশ্বরের নামে এই তরবারিহস্তে দণ্ডায়মান হইতেছি, ঈশ্বর আমার সহায়, যে কেহ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিবেন, আসুন, আমি তাঁহাকে সমরে আহ্বান করিতেছি, ঈশ্বর-সহায়ে আমি তাঁহাকে জয় করিব। আর ইহাও আমার স্থির বিশ্বাস যে, শেষ বিচারের দিনেও ঈশ্বর আমার অনুকূলে দণ্ডায়মান হইবেন।"

এই বীরপুরুষের ঈশ্বর তাঁহারই ন্যায় একজন বীর্য্যবান পুরুষ। আমার বোধ হয়, শেষ বিচারের

দিনে তিনি তাঁহার ভক্তের এই কামনা বিফল করিবেন না। ৪

যদিও আমরা বলিতেছি, ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ কল্পনা এবং মানসিক চিন্তা, তথাপি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনকালে ইহা সুনিশ্চিত সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। মানবের মনোরাজ্যে প্রত্যেক কল্পনাই অখণ্ড সত্য স্বরূপ। একটি কল্পনার প্রভাবে অপরাপর কল্পনা স্ফূর্ত্তি পায়; ব্রহ্ম-কল্পনার ন্যায় মধ্য-

৪ এই বিশ্বাসটিও আর্য্যগণের বিশ্বাসের অনুরূপ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে নিজ ভক্ত অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন;—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজ্যামহং—" আমার ভক্তগণের মধ্যে যিনি যে ভাবে আমাকে চিন্তা করেন, অথবা যিনি যেরূপ বৃত্তি আমাতে সমর্পণ করেন, আমি সেইরূপেই তাঁহার ধ্যানের বিষয় হইয়া থাকি। পরম ভাগবত প্রহ্লাদের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত বিশ্বব্যাপক সর্ব্বান্তর্য্যামী নরসিংহ-মূর্ত্তিতে স্তম্ভমধ্য হইতে দর্শন দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তি-মান্ পুরুষকে, ভক্তের ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার কামনার অনুরূপ রূপ ধারণ করিতে অসমর্থ বলিলে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার সঙ্কোচ করা হয় না কি?—অনুবাদক।

প্রসারিত কল্পনা আমাদের সমস্ত কার্য্যের পরিব্যাপক এবং আমাদের জীবনের পূর্ণ বিকাশের সর্ব্বপ্রধান নিয়ামক।

প্রাকৃতিক আদিম লক্ষণানুগত ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সংসারে সমষ্টীভূত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা বহুদেবের উপাসনাবাদ, বিশ্বব্রহ্মবাদ, একেশ্বরবাদ, ব্রহ্মজ্ঞানবাদ, অদ্বৈতবাদ এবং নিরীশ্বরবাদের উল্লেখ করিতেছি।

পুরাকালের সভ্যতম মানবজাতির বহুদেবদেবীর উপাসনায় বিশ্বাস ছিল। হোমরের সময়ে গ্রীক জাতি বহুদেবতার উপাসনা করিতেন; খ্রীষ্ট জন্মিবার সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে হিন্দুজাতি বহুদেবদেবীর উপাসক ছিলেন। ৫ বহুদেবতার উপাসনা বাদে এই বিশ্বাস যে, কল্পনার বস্তু সাকার, দেবদেবীগণ সকলেই মনুষ্যের ন্যায়

৫ এবং এখনও আছেন।— অনুবাদক।

মূর্ত্তিবিশিষ্ট ;—উপাসকেরা বজ্রনাদে বজ্রধরের বাক্য শ্রবণ করিতেন, সূর্য্যের রথে দেব-সারথি দেখিতে পাইতেন, এ সকল তাঁহাদের কল্পনা প্রসূত ;—কল্পনা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিত, কল্পিত দেবতারা সাকাররূপে বিরাজমান। ৬ বহু-

৬ দেবদেবীর উপাসনা বিষয়ে আমরা পৃথিবীর অপরাপর জাতির কি মত তাহার আলোচনা করিতে চাহি না ; কিন্তু হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, তাঁহারা যে সকল দেবদেবীর উপাসনা করিতেন বা করিয়া থাকেন, সে সকল দেবদেবী কেবল তাঁহাদিগের কল্পনা প্রসূত নহেন, উহাঁরা ঐতিহাসিক স্ত্রী-পুরুষ। হিন্দুশাস্ত্র সকল স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন যে, ঐ সকল দেবদেবী এককালে এই পৃথিবীতেই মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপাসনাবলে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যদি জীব-আত্মা অবিনশ্বর বস্তু হয়েন, তবে তাঁহাদিগের স্বর্গাদি লোকান্তরে অবস্থানও অসম্ভব নহে। আর হিন্দুরা যে ঐ সকল দেবদেবীর প্রতিমা রচনা করিয়া তাহাতে আবির্ভূত দেবদেবীর পূজা করেন বা ঐ রূপ পূজাকে তাঁহাদিগের আত্মোন্নতির সাধন বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাও ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুরোধে

দেবের উপাসনার পূর্ব্বে আর এক প্রকার মত প্রচলিত ছিল, ভট্ট মোক্ষমূলর তাহাকে সৃষ্টিবাদ

নহে; কারণ, শাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারাও তাদৃশ দেবদেবীর আবির্ভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে। এবং বিশ্বব্যাপিয়া ঐশ শক্তির ধারণা অপেক্ষা প্রতিমাতে আবির্ভূত খণ্ড শক্তির আত্মশক্তির ধারণা যে অনেক সহজ তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। যদি মানব নিজশক্তিবলে মহায়সী প্রকৃতির প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে, অথবা স্বকীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে, সৎপ্রবৃত্তি সকলকে বর্দ্ধিত করিতে, অসৎপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া পরকীয় শক্তির—ঐশশক্তির—সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করেন, তবে অধিকারী বিবেচনায় ক্রমান্বয়ে খণ্ড হইতে অখণ্ড শক্তির আভিমুখ্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাদৃশ শক্তিসকলে চিত্তের প্রতিধান যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা বোধ হয়, কোন বিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। যদি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইল, তবে যোগদৃষ্টিতে—সূক্ষ্মদৃষ্টিতে—বর্ত্তমান দেবদেবীর প্রতিমা হইতে বিশ্বব্যাপক বিরাট মূর্ত্তির উপাসনা পর্য্যালোচনা করিলেই সর্ব্বোবিধ সংশয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে। প্রাকৃত জীব উপাসনার প্রথম অবস্থাতেই যে কিরূপে প্রকৃ-

বলিয়া কীর্ত্তন করেন;—সমস্ত সৃষ্টবস্তুই ঈশ্বর-ব্যাপক। মনুষ্য, নদ, নদী, জলপ্রপাত, পর্ব্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্তই দেবতা বলিয়া উপাসিত হইত। মানবজাতির সমাজের শৈশবাবস্থায় সৃষ্টিবাদতত্ত্ব এতদূর স্বাভাবিক ছিল যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমাদিগের চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত সৃষ্টপদার্থই

তির অতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান করিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি কাহাকেও ঐরূপ চিত্ত সমাধানে সমর্থ দেখা যায়, তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, তিনি একদিনে কখনই তাহার দুরূহ ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হন নাই। তিনি অবশ্যই ক্ষীতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভূত সকলকে অতিক্রম পূর্ব্বক গন্ধাদি গুণ সকলের ধারণার অনন্তর অবশেষে আত্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তবে যদি কোন মহাপুরুষ এককালেই ঈশ্বর প্রণিধানে সমর্থ হয়েন, তাঁহার জন্য প্রতিমাপূজার উপদেশ হয় নাই, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ফলতঃ এই সকল তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিমা পূজা কল্পনার সামগ্রী না হইয়া বরং বিজ্ঞানের সামগ্রী বলিয়া পরিচিত হইবে।—অনুবাদক।

আমাদিগের ন্যায় সজীব;—সামান্যতঃ কেবল গতিশীল বলিয়াই সজীব বলা হইত এমন নহে, বিশ্বাস ছিল যে, সমস্তই আমাদের মত আত্মা-বিশিষ্ট সজীব। এই সৃষ্টিবাদতত্ত্ব পৌত্তলিকতা হইতে পৃথক্ ভাবাপন্ন; কারণ, পৌত্তলিকেরা প্রতিমাপূজক। আরণ্য অসভ্য জাতির মধ্যেই পৌত্তলিকতা-পদ্ধতি প্রবল; তদ্দ্বারা মানসিক ধর্ম্মভাবের অধঃপতন হয়। সৃষ্টবস্তুর উপাসনাতে পৌত্তলিকতার অনেকদূর সৌসাদৃশ্য আছে বটে, তথাপি উহার প্রকৃতিতে পরিচয় পাওয়া যায় যে, উহা অবশ্যই প্রদীপ্ত প্রভাত আগমনের আশা-প্রদায়িনী ঊষা। [৭]

---

৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২।১ অধ্যায় পাঠ করিলেই এই বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে। ঐ স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, সৃষ্টবস্তুমাত্রেই আমার শক্তি প্রকাশ মাত্র। তবে ঐ সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে যে সকল বস্তুতে শক্তির আধিক্য দৃষ্ট হইবে তাহাদিগকেই আমার সত্ত্বাংশ সম্ভূত বলিয়া জানিতে হইবে।

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবতাবগচ্ছ ত্বং মম সত্ত্বাং সম্ভবং॥"—অনুবাদক।

বহুদেবদেবীর উপাসনা প্রণালী আজিও বিদ্যমান আছে। পবিত্রাত্মা, আত্মোৎসর্গী, পবিত্র কুমারী, দেবদূত, নরকের পিশাচ, এ সকলে বিশ্বাস, ইহা কেবল খ্রীষ্টীয় মতাবরণে ধর্ম্মভানে বহুদেবতার উপাসনা-রীতিমাত্র।

বহুদেবের উপাসনা পদ্ধতি স্বভাবতঃই একেশ্বরবাদে পরিণত হয়; কেন-না, সে মতে সর্ব্বদেবতাই এক এবং একেশ্বরই সর্ব্বদেবময়। সেই সর্ব্বসমষ্টি একমাত্র দেবতাই এই বিশ্বের অলৌকিক ব্যাপারের সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু; তদনুসারে ঐ একেশ্বরবাদে ইহাই প্রতিপন্ন করে যে, কেবল একমাত্র ঈশ্বর আছেন; সেই একমাত্র ঈশ্বর আমাদের মত দেহধারী, রিপুপরবশ এবং তিনি আমাদের মত সুখ-দুঃখ অনুভব করেন।

একেশ্বরবাদ বাস্তবিক য়িহুদী অথবা খ্রীষ্টীয় জ্ঞানাবিষ্ক্রিয়া নহে;[৮] গ্রীসের ইতিহাস প্রমাণে

৮ কথনই না। স্মরণাতীত কালে আর্য্য-ঋষির মস্তিষ্ক হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই তত্ত্ব প্রসূত হইয়াছে।

এথেন্‌সের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে পূর্ণ সমৃদ্ধিকাল পর্য্যন্ত ইহার আবির্ভাব। তাহার পর য়িহুদী জাতীয় মুসা হইতে ঈশার সময় পর্য্যন্ত ইহা প্রবল হইয়াছিল। তাদৃশ সময়ে সর্ব্ব-কর্ম্মেই ঈশ্বরজ্ঞান বিনিযোজিত হইত, ইহা অবশ্যই স্বাভাবিক; হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ ভক্তি-ভাবেই উপাসনা পদ্ধতির উৎপত্তি।

একেশ্বরবাদের অভ্যুদয় সময়ে ঈশ্বরই সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বস্তু হইয়াছিলেন। সিরাকিউজের শাসনকর্ত্তা দায়োনিসস্ একদা গ্রীসের সপ্ত পণ্ডিতের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঈশ্বর কি?" পণ্ডিত এই প্রশ্নের উত্তর স্থির করিবার নিমিত্ত এক দিন সময় চাহেন। পর দিন সেই পণ্ডিত পুনর্ব্বার বিবে-চনার জন্য আরও দুই দিন সময় প্রার্থনা করেন। সেই অবসর কালে তিনি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। সময় পূর্ণ হইলে তিনি তৃতীয় বার চিন্তা করিবার

সময় চাহেন;—সে বারে তিন দিনের অবসর পাইতে ইচ্ছা করেন। দায়োনিসস্ অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সেই দার্শনিক পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন যে, যতই দীর্ঘ কাল তিনি এইবিষয় চিন্তা করিতেছেন, ততই আরও ঘোর অন্ধকার ও দুর্ভেদ্য দুর্ব্বোধ ও রহস্যব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে।

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-মন্দিরে একেশ্বরবাদ পরিগৃহীত হইয়াছে; তথাপি তৎসঙ্গে আর্য্য-ধর্ম্মানুগত ঈশ্বরের ত্রিদেবত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালীন বহুদেব-তত্ত্ব হইতেই স্বভাবতঃ একেশ্বরবাদের অভ্যুদয়;—কালক্রমে একেশ্বরবাদের মূলসূত্র "ঈশ্বর কি?" প্রজ্ঞাবান্ সাহসিক দার্শনিকেরা এই গূঢ় প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন;—ঈশ্বর আমাদিগের ন্যায় কোনরূপ দেহধারী ব্যক্তি নহেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই বিশ্বসংসার। এই যে মত, যেমতে সমস্ত জগৎ এবং ঈশ্বর একই পদার্থ, সেই মতের নাম বিশ্বব্রহ্মবাদ।

একেশ্বরবাদে দুই ভাব ব্যক্ত করে; কেন না, এমতের বিশ্বাস, প্রকৃতির অতিরিক্ত একজন পুরুষ আছেন। বিশ্বব্রহ্মবাদই একেশ্বরবাদের প্রারম্ভ সূত্র। স্পাইনোজার উদ্ভাবিত ব্যবস্থাই বিশ্ব-ব্রহ্মবাদ; এই মতের ছন্দোবন্ধ ও তত্ত্ববিকাশ-প্রভাবে মনুষ্যের অন্তরে যেন মোহন মন্ত্রের পরাক্রম প্রভাসিত হইয়াছিল।

বিশ্বব্রহ্মবাদের পরাক্রমে একেশ্বরবাদ অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। স্বভাবের উপর অন্য এক দেবতা, প্রাচীন মতে প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরসত্তা অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। সাকার ঈশ্বরের মূল সূত্রে তত্ত্বশাস্ত্রেও আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটে;—সেই পরিবর্ত্তনে দুটী নূতন মতের উদ্ভব হয়;—ব্রহ্মবাদ এবং অদ্বৈতবাদ। বিজ্ঞানোজ্জ্বল অষ্টাদশ শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদের গৌরব হইয়াছিল। ফ্রান্সের ভল্টেয়ার ও রুসো, ইংলণ্ডের শাফ্‌ট্‌স্‌বরি এবং জর্ম্মণির লেসিং এই মতের প্রতিপোষক।

অদ্বৈতবাদীর বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর সাকার, তিনিই জগৎ সংসারের সৃজনকর্ত্তা ;—কিন্তু একেশ্বরবাদীর ঈশ্বর হইতে অদ্বৈতবাদীর ঈশ্বর বিভিন্ন প্রকার। অদ্বৈতবাদীর মতে অলৌকিক ব্যাপার অসম্ভব; ঈশ্বর কদাচ প্রাকৃতিক নিয়মের উপর হস্তার্পণ করেন না।

ব্রহ্মবাদ অনেক অংশে স্থাপিত মতের অনুগত। সাকারতত্ত্বের অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের সংস্কার করিয়া ঈশ্বর-কল্পনাকে বিশুদ্ধ করাই ব্রহ্মবাদের সূত্র। ব্রহ্মবাদী বলেন, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; সমস্ত বিশ্বব্যাপারেই তিনি সংলিপ্ত, অথচ সর্ব্ববিষয়েই নির্লিপ্ত। প্রাকৃতিক নিয়ম এবং অলৌকিক ঘটনাবলী ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র। রাজা যেমন সাধারণ ব্যবস্থা ও বিশেষ বিশেষ বিধি প্রচার করেন, ঈশ্বরের কার্য্যও তদ্রূপ।

সমস্ত মৌলিক লক্ষণে একেশ্বরবাদী, অদ্বৈত-বাদী এবং ব্রহ্মবাদীর ঈশ্বর অভিন্ন। ঈশ্বর স্বতঃ-

পূর্ণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, উল্লিখিত মতত্রয়ে সমভাবেই এই ভাব ব্যক্ত করে; তথাপি আমরা অকপটে স্বীকার করিতে পারি যে, অপর দুই মত অপেক্ষা অদ্বৈতবাদের মীমাংসা প্রণালী নিয়তই দর্শন-বিজ্ঞান-যুক্তিতে সমধিক পরিষ্কার ও সারগর্ভ।

এই সকল মতের বিপক্ষতা সাধনার্থ নিরীশ্বরবাদের উৎপত্তি। ব্রহ্মবাদ হইতে অব্রহ্মবাদে পরিণতির নাম নাস্তিকতা। নাস্তিকতার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতির মধ্যে অথবা প্রকৃতির পশ্চাতে কোন অজ্ঞেয় পদার্থ আছে, সেই জ্ঞানাতীত বস্তুই সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তাহাই সমস্ত অদ্ভুত বিশ্বব্যাপারের মূলীভূত কারণ।

নিরীশ্বরবাদ নিতান্ত আধুনিক মত, কিন্তু উহাই চরম সিদ্ধান্ত নহে। নিরীশ্বরবাদ কদাচ স্থায়ী হইতে পারিবে না; কারণ উহার কোন একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, উহা কেবল নাস্তিত্ব-বোধক এবং সমস্ত প্রচলিত মতের দোষ-বিঘোষক

প্রতিবাদী। নিরীশ্বরবাদীর বিশ্বাস কিসে, নিরী-শ্বরবাদী তাহা কিছুই প্রকাশ করে না; প্রচলিত মতে বিশ্বাস করিতে নাই, কেবল ইহাই ব্যক্ত করে। বিশ্বব্রহ্মবাদ হইতেই নিরীশ্বরবাদের উৎ-পত্তি এবং ইহা জড়বাদ-দর্শনের পন্থানুগামী। বিশ্ব-সংসারই ঈশ্বর, নাস্তিক এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে; কেন না, জড়বাদের শিক্ষাই এই যে, বিশ্বসংসার কেবল ভূতের গঠন; সুতরাং ভূত কদাপি ভক্তি-ভাজন অথবা উপাস্য হইতে পারে না। নিরী-শ্বরাদী বলেন, বিশ্বব্রহ্মবাদের যদি কিছু অর্থ থাকে, সে অর্থ কেবল বিপথে লইয়া যায়; এবং জগদাত্মা শব্দে মিথ্যা কল্পনা সৃজন করে;—এরূপ মত নিতান্তই ভ্রান্ত, এ সম্বন্ধে একেশ্বরবাদও বহুদেববাদ যেমন অমূলক, বিশ্বব্রহ্মবাদও অবিকল সেইরূপ অমূলক।

ব্রহ্মকল্পনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব লক্ষণের দোষ কীর্ত্তন এবং অভাব দর্শন সম্বন্ধে নাস্তিকতা যেরূপ তর্ক উপস্থিত করে, তৎপ্রসঙ্গাধীনে সেই অংশে নিরী-

শ্বরবাদ অবশ্যই যথাবাদী; কিন্তু তাহা বলিয়াই কি ঐ মতে অনুমোদন করিয়া আমাদিগকে নাস্তি-ফলে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক।

বাস্তবিক ব্রহ্মকল্পনার মধ্যে কোনরূপ সত্যতত্ত্ব নিহিত আছে কি না এবং নিরীশ্বরবাদ যাহা বলে,—ঈশ্বরে বিশ্বাস কেবল মানব সমাজের মহাস্বপ্ন, বাল্যকল্পনার মোহ মাত্র; বাস্তবিক ইহাই সত্য কি না, তাহাই দেখিতে হইবে।

ঈশ্বর অপ্রত্যক্ষ পদার্থ; যদিও অপ্রত্যক্ষ-কল্পনা চেয়ার, টেবিল, বৃক্ষ ও কুক্কুরাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ বস্তু না হউক, কিন্তু উহা সর্ব্বদা অনুভবে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রকৃত বলিয়াই গণ্য।

দয়া অথবা পবিত্রতা যদিও সজীব রূপবতী কামিনীর ন্যায় মূর্ত্তিমতী নহে, কিন্তু যখন দয়াবান্ পুরুষ ও পুণ্যবতী রমণীর বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন অবশ্যই দয়া ও পবিত্রতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; উহা কদাচ বিভ্রম

অথবা কল্পনার মোহ হইতে পারে না। পুণ্য-স্থানের অন্তরেই পুণ্যের স্থিতি, সুতরাং পুণ্য-কল্পনাকে সজীব বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত; মানব-মানসের কল্পনারাজ্য হইতে উহাকে উৎপাটন করিয়া দেওয়া কদাচ কর্ত্তব্য হয় না।

ব্রহ্মকল্পনাও কি বাস্তবিক ঠিক ঐ প্রকার নহে?—নিশ্চয়ই ঐরূপ। প্রকৃতির অতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, অবিনাশী, অথচ মরণ-ধর্ম্মক মনুষ্যের ন্যায় আত্মাভিমানী কোন সাকার দেবতা নিশ্চয়ই নাই। পুণ্যবানের শরীরে যেমন পুণ্যের অবস্থান, প্রকৃতি-শরীরে অথবা মানব-শরীরে এমন ঐশী শক্তি কিছুই নাই, যদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রমাণে ঈশ্বরের প্রকৃত বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইতে পারে। দয়া, ধর্ম্ম এবং অপরাপর অপ্রত্যক্ষ কল্পনার অস্তিত্ব যে প্রকার, সেই প্রকার প্রমাণেই সিদ্ধ হয়, অবশ্যই ঈশ্বর আছেন। কিন্তু যদবধি প্রতিমাপূজকের ধারণা অনুযায়ী প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অথবা অদ্ভুত-দর্শন সিদ্ধান্তের শৃঙ্খল হইতে

আমদের অন্তঃকরণ বিমুক্ত না হইতেছে, তদবধি ঈশ্বর-তত্ত্ব আমাদের মনে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরকে কাণ্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই বিশ্বাস করিলে আমরা ঈশ্বর-তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিব। কাণ্ট বলিয়াছেন, ঈশ্বর কেবল নাম মাত্র, অন্তরের কল্পনা।

মাথ্ আর্নল্ড বলিয়াছেন, ঈশ্বর কেবল শক্তিস্বরূপ; তাহা বিশুদ্ধ মঙ্গল উৎপাদিকা; সে শক্তি আমাদের মধ্যে নাই। আর্নল্ড আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে কেন বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না। আমাদের মধ্যে কি ঐশী শক্তি কিছুই নাই? আর্নল্ডের যুক্তি আমরা খণ্ডনে প্রয়াস পাইব। যে শক্তি মঙ্গল উৎপাদিকা, সেই শক্তির বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রকাশ; সমস্ত মানব জাতিতে সেই শক্তির আবির্ভাব, আমাদের মধ্যেও সেই শক্তি আছে।

জে, আর্, সিলী প্রকৃতির সামঞ্জস্য সংসারে ঈশ্বর দর্শন করেন; সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সম-

ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ; সকলকেই সেই নিয়মের অনুগত হইয়া চলিতে হয়; নিয়ম লঙ্ঘন করাই পাপ। পাপ করিলেই দণ্ডভোগ করিতে হয়।

আর্‌নল্‌ড এবং সিলী, উভয়ের যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত আমাদিগকে কিছু অধিক দূর যাইতে হইবে। ইহাঁরা উভয়েই আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই এখনও একেশ্বরবাদীর জ্ঞান এবং প্রকৃতির অতীত এক-দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই।

সিলী বলেন, প্রকৃতির নিয়মই ঈশ্বরের নিয়ম। কিন্তু প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত নহেন। যে ঈশ্বর প্রকৃতির অন্তর্গত, সেই তিনিই আবার প্রকৃতির বহির্ভূত; সুতরাং অপ্রাকৃতিক অলৌকিকত্বই বুঝিতে হয়।

ফিস্কির মতে আরও গুরুতর আপত্তি আছে। বিশ্বরঙ্গভূমে নাট্য প্রণালীতে তিনি অনন্ত শক্তির সমবেত অভিনয় দর্শন করেন। পেলীর একেশ্বর-

বাদে তাঁহার আস্থা নাই; তিনি তাঁহার ঈশ্বরকে পরমার্থ জ্ঞানে বিভূষিত দেখেন, অথচ ঈশ্বরকে মানবধর্ম্মী সাকার বলিয়া স্বীকার করেন না।

না করুন, তথাপি এই সকল মতে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশমান; ব্রহ্মকল্পনার ভবিষ্যত ফল কি দাঁড়াইবে, তাহাই তাঁহারা স্থির করিবার জন্য বিধিমতেই চেষ্টা করিতেছেন।

অপরাপর গ্রন্থে আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং ঈশ্বর বস্তু প্রধানা প্রকৃতির আধ্যাত্মিক জীবন। স্বাভাবিকী যুক্তিতে যতটুকু সত্য পাওয়া যাইতে পারে, ঐ সিদ্ধান্তের মধ্যেই সেই সত্যটী বিদ্যমান আছে; অথচ ইহার মধ্যে অপ্রাকৃতিক এবং সাকার মূলক কোন প্রকার জটিলতা নাই।

এই অর্থে ঈশ্বর হইতেছেন বর্দ্ধনশীলজীবন, উন্নতিশীল মনুষ্যত্ব। প্রাচীন মতে ব্রহ্মকল্পনার এই অঙ্গটি মহত্ত্বের কল্পনা। কিন্তু ইহা কেবল কল্পনা মাত্র নহে, কল্পনার সার।

কল্পনা পদার্থ যখন মনোমধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত

হয়, তখন সারত্ব জন্মে। আমাদের উচ্চ আশা চরিতার্থ করিবার উহাই একটী মূল সাধন; উহাই আমাদের লক্ষ্য, উহাই আমাদের উদ্দেশ্য। কল্পনার সারকে সজীব কল্পনা বলা হয়; যেহেতু পুনঃ পুনঃ আলোচনায় ক্রমশই অধিক-তর বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যে প্রণালীতে আমরা এই ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, সে প্রণালী যে অতি অল্প লোকেরই মনোনীত হইবে, তাহা আমরা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু যাঁহারা এই তত্ত্বকে নিরপেক্ষ চক্ষে দর্শন করিবেন, মত-ভেদের তীব্রযুদ্ধে অথবা সাম্প্রদায়িক ঘৃণা বিদ্বেষে যাঁহারা অন্ধ হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই জন কতক আমাদিগের এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করিবেন।

ঈশ্বরকে লইয়া যাঁহারা রণমত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আমাদিগকে নাস্তিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন; কেন-না, আমরা বলিতেছি,

ঈশ্বর আমাদের মত হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্য নহেন; কেহ কেহ হয় ত আমাদিগকে খাম্‌খেয়ালী প্রলাপ-বাদী মনে করিয়া নিন্দা ও উপহাস করিবেন; কেন-না, আমরা বলিতেছি, আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বের কতক কতক সত্য, কতক কতক ভুল।

উভয় পক্ষেরই আপত্তি খণ্ডনে আমরা প্রয়াস পাইব। যাঁহারা আমাদিগকে নাস্তিক মনে করিবেন, তাঁহাদের কথার উত্তর এই, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা কেবল প্রতিমা পূজা এবং তদনুরূপ অন্যবিধ কুসংস্কারগুলি অগ্রাহ্য করিতেছি;—ঈশ্বর আমাদের মত দেহবিশিষ্ট, রিপু পরবশ;—ঈশ্বর অপ্রাকৃতিক;—কেবল এইগুলিই আমরা স্বীকার করি না; তদ্ভিন্ন যেগুলি সৎ, যেগুলি মহৎ, যে গুলি সত্য, যে গুলি সুন্দর, সে গুলির আমরা বিরোধী নহি। কল্পনার বিশুদ্ধতা সাধন করা যদি নাস্তিকতা হয়, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক নাস্তিক নাম গ্রহণ করিব, নাস্তিক হওয়াটা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিব।

দ্বিতীয় দলের আপত্তি সম্বন্ধে আমরা এই বলি, যাঁহারা প্রতিমা ভঞ্জনে উন্মত্ত, তাঁহারাই চিত্তের স্থিরতা ও বাক্যের স্থিরতা রাখিতে পারেন না; সামঞ্জস্য বিধানে ধৈর্য্যের তাঁহাদের একান্ত অভাব। ব্রহ্মকল্পনাকে যদি শূন্যগর্ভ স্বপ্ন বিবেচনা করিয়া, আমাদের মন হইতে এককালে দূর করিয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে জগতের সমস্ত কল্পনাকে এবং সমস্ত কল্পনার বস্তুকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য না হয় কেন? তাহাওত ঐ প্রকার যথার্থ মান্য, ঐ প্রকার ঠিক অপ্রত্যক্ষ সত্য। দয়া, সাধুতা, কর্ত্তব্যতা, আশা, বৈজ্ঞানিক আদর্শ, শিল্পজ্ঞান, এসকলের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি নাই, তবেত কল্পনা প্রসূত ঐ প্রকার সার সত্যগুলির অস্তিত্বও কিছুই নহে, কেবল প্রত্যক্ষসিদ্ধ জীব-শরীর ব্যতীত প্রকৃত পদার্থ আর কিছু থাকা অসম্ভব। এই যুক্তি প্রমাণে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়, তবেত বীজগণিতের কাল্প-নিক পূর্ণাঙ্ক এবং শূন্যাঙ্কের অস্তিত্বকে অস্বীকার

করিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বও যেরূপ, উহাও সেইরূপ সত্য। বস্তুতঃ কল্পনাগত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মানব জাতির মহা উপকার। ধর্ম্ম জ্ঞান, মানসিক চিন্তা, মানুষের কার্য্যতৎপরতা, মানুষের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব, এই সমস্তই ঈশ্বর জ্ঞান হইতে উদয় হয়। বাণিজ্য জগতে সততা-কল্পনা, সংগ্রাম সংসারে সাহস-কল্পনা, বিজ্ঞান কাননে সত্য-কল্পনা, মানব সংসারে যেরূপ আবশ্যক, ব্রহ্ম-কল্পনার অস্তিত্ব স্থিতিতে বিশ্বসংসারেও সেইরূপ প্রয়োজন।

এই সকল আলোচনায় এই ফল হইবে, ঈশ্বরকে আমরা প্রকৃতির আধ্যাত্মিক জীবন বলিয়া গ্রহণ করিব। আকার বিশিষ্ট, স্বভাবের অতিরিক্ত, মহাশক্তিমান এক স্বতন্ত্র পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিব না। একথায় অনেকে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই সত্য স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন; অথচ পুরুষের

পুরুষত্বই তিনি, নারী জাতির নারিত্বই তিনি। যীশুখৃষ্ট বলিতেন, ঈশ্বর তাঁহার পিতা। মানব মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান; যেহেতু প্রকৃতির আধ্যাত্মিক জীবন হইতে মানবজাতি সমুৎপন্ন। যীশুখৃষ্টকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তোমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি তাঁহাকে কেমন করিয়া জানিতে পারিলে? যীশু তখন উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি আর আমার পিতা এক।" ঈশ্বর স্বয়ং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক জীবন। মনুষ্য সেই জীবনের অবতার;—মনুষ্য আর ঈশ্বর এক। যীশুখৃষ্ট এই সত্য স্বীকার করেন, আমাদিগেরও বক্তব্য, প্রকৃত মনুষ্যত্বই ঐশীশক্তি। কোন অগম্য, অজ্ঞাতব্য, অন্ধকার স্থানে ঐশীশক্তি লুক্কায়িত নাই, প্রকৃত মনুষ্যত্বই ঐশীশক্তি, প্রকৃতির আধ্যাত্মিক জীবনই ঐশীশক্তি, মানুষের কল্পনার পরিপক্কতায় ঐশীশক্তি।

ঈশ্বরের বিষয়ে আমাদিগের যে মত তাহা অদ্বৈতবাদ নহে, বিশ্ববাদ নহে, নিরীশ্বর-

বাদও নহে। জগতে মাথার উপর এক ব্যক্তি আছেন, সে ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে এক নহেন, অতিরিক্ত পুরুষই ঈশ্বর, আমরা এ কথা বলি না; একেবারে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেও বলি না। একেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, অদ্বৈত-বাদ, ব্রহ্মবাদ, ইত্যাদি বহুবাদ ভাণ্ডারের মধ্যে আমাদের বাদটীকে যদি পৃথক করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে তত্ত্ববাদ বলিব। ঠিক একেশ্বরবাদের কল্পনার মত একটী মাত্র কল্পনা;—সেটী অন্তরবাসী, চিরপূর্ণ নহে, ক্রম বিকাশ,—তিনি বহু প্রকারে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন;—অথচ সর্ব্ব প্রকৃতিতে সমভাবে অব-স্থিত; লিপ্ত অথচ নির্লিপ্ত।

অদ্বৈতবাদ, বিশ্ববাদ এবং নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে এই একতত্ত্ববাদের অনেক বিষয় বিরোধ হইবে বটে, তথাপি বহুস্থলে ঐক্য আছে। তিন মতেই কিছু না কিছু সত্য পাওয়া যায়। প্রকৃ-তির যে প্রকৃত মঙ্গল-শক্তি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের

মঙ্গল স্বরূপ, সেই শক্তিই ঈশ্বর। অদ্বৈত-বাদের মতের সহিত আমাদের একতত্ত্ববাদেরও পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃতির নিয়মের নাম ঈশ্বর এই বিশ্ববাদী মতের সহিতও আমাদের ঐক্য আছে। আমরা বলি নিয়ম প্রকৃতির প্রধান ;—সেই নিয়ম প্রকৃতই যেন বিশ্ব ক্ষেত্রে সর্ব্বব্যাপী। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম সেই উদার নিয়মাবলীর একটী উচ্চ উদাহরণ। আমাদের একতত্ত্ববাদের যিনি ঈশ্বর তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর সমষ্টি, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই;—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক গাছি শান্তি সূত্রে আবদ্ধ। নাস্তিকতার সহিতও একতত্ত্ববাদের কতকটা সামঞ্জস্য আছে ! নাস্তিকতা যেখানে জন্ম-মৃত্যুশীল মনুষ্যের শরীরের সঙ্গে ঈশ্বরের রূপ ও কার্য্য-কল্পনার নিসংশয়িত উত্তর প্রদান করিয়াছে, যেখানে প্রকৃতির অতীত স্বতন্ত্র এক ঈশ্বরের অস্তি-ত্বের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে, আমাদিগের মত নাস্তিকতার সহিত সেই সেই স্থানে অভিন্ন। এই স্থলে একটী গুরুতর কথা উঠিতেছে। কল্পনালব্ধ

ঈশ্বর বিশুদ্ধ যুক্তিমতে প্রকৃত উপসনার সামগ্রী কি না? আমাদের উত্তর এই;—উপাসনাকে যদি বাহ্যভাব মনে করা হয়, ব্যবহার মত কেবল কাকুতি মিনতি করিয়া, জোড় করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে ছোট বলিয়া স্বীকার করা, পূজা গৌরবে অরাধনা করা, ইহা যদি উপাসনার অঙ্গ হয়, তাহা হইলে সে উপাসনার আবশ্যক নাই। যদি কোন বস্তুর অথবা কোন ব্যক্তির কোন কিছু গুণ অথবা কোন কিছু কার্য্য মনে মনে ধারণা করিয়া, মনে মনে আকৃষ্ট রাখা যদি উপাসনার অঙ্গ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের জীবনের, এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিতে আসিতেছে তাহাদিগের জীবনের, মঙ্গলের নিমিত্ত ঈশ্বরের উপাসনা করা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মহাপুরুষেরা যে রূপ আদেশ করিয়াছেন, "যে সত্যের সহিত আত্মার সম্মিলন করিয়া উপাসনা কর," প্রকৃত পক্ষে সেই

রূপ উপাসনাই উপাসনা; এইরূপ উপাসনার ফলে আমরা সুখী হইতে পারিব, আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়িবে,—সমস্ত সংসারের ঐক্য বন্ধনে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে।

যে কারণে উপাসনা আবশ্যক, সেই কারণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা আবশ্যক। সকাতরে সজল নয়নে করজোড়ে বিনীতভাবে ভিক্ষুকের ন্যায় প্রার্থনা করাও ঘৃণার্হ। কেবল আপনাকে ছোট করিলেই প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনাতে যদি আত্মসংযম থাকে, কৃত পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত থাকে, ভবিষ্যতে আর পাপ করিব না, দৃঢ়চিত্তে এমন যদি একাগ্রতা থাকে, প্রার্থনা যদি আমাদিগকে এই প্রকারে ঈশ্বরের সঙ্গে একতা সূত্রে আবদ্ধ রাখে, তাহা হইলে সেই প্রার্থনা অবশ্যই মঙ্গলবিধায়িণী;—সেই প্রার্থনা সর্ব্ববিধায়ে বিশুদ্ধ যুক্তিরও অনুমোদিত। কেন-না, সেই ঈশ্বর এই বিশ্বসংসারের আধ্যাত্মিক জীবন।

উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা আমাদের ঐহিক ও

পারত্রিক ইষ্ট সংসাধিত হয় এরূপ জ্ঞান,—ভগবানের বিশুদ্ধ অস্তিত্বে অবিশ্বাস ও কাল্পনিক ঐশীশক্তি সমষ্টির পূজা,—পৌত্তলিকতার অঙ্গমাত্র। যে শক্তির বলে আমাদিগের ইহজীবনে ও পর-জীবনে সর্ব্বথা মঙ্গল হয়, ঈশ্বর সেই অনন্ত শক্তির সমষ্টি,—এরূপ জ্ঞান করা পৌত্তলিক বিশ্বাস নয় ত আর কি? উপাসনা কেবল একই প্রকার;—আত্মার সহিত সত্যের সম্মিলন করিয়া উপাসনা করাই অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করাই, প্রকৃত উপাসনা। আর এরূপ উপাসনা ভৌতিক উপাসনা নহে;—কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছা-গত নিয়ম পালনে প্রস্তুত হওয়ার নামই আত্ম-সংযম। নৈতিক অনুশাসনের উৎকর্ষতা সাধন ভিন্ন ঈশ্বরের আর অন্য ইচ্ছা কি হইতে পারে? জগতের সমস্ত ধর্ম্ম ও সমস্ত দর্শনশাস্ত্র এই নীতি প্রমাণে পরস্পর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত।

কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, ঐ সকল মঙ্গলময় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগের সময়ে

সময়ে অনেক ইষ্ট সাধন হয়;—সাধুলোকে বিপদে পড়েন, পাপীরা ঐশ্বর্য্যবান হয়; কিন্তু তাহা আশু বিনশ্বর। যদিও দুরন্ত লোকেরা ধর্ম্মশীল প্রতিবাসীর অপকার, এমন কি উৎচ্ছেদ সাধনও করিতে পারে, কিন্তু এটী নিশ্চয় যে অধর্ম্ম কখন পরিণামে প্রবল থাকিতে পারিবে না, যাহারা অধার্ম্মিক, যাহারা পাপ কার্য্যে রত, অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম পালনে পরাঙ্মুখ, তাহারা নিশ্চয়ই পরিশেষে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে; সর্ব্বভূতে সমতা রাখিয়া, সর্ব্বমঙ্গলের অভিলাষে যাঁহারা সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ম গুলির সুশৃঙ্খলা রাখিতে তৎপর, কেবল তাঁহারাই পরিত্রাণ পাইবেন। অনন্তকালাবধি এই সত্য সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। এ সত্য হইতে পরিচ্যুত হইলে কিছুতেই অব্যাহতি নাই। হইতে পারে, মিথ্যাও কখন কখন লাভ দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সত্য চিরকাল কেবল মঙ্গল লাভেরই সহায় হইয়া থাকে;—অসাধু লোকেরা বালুকার উপর

গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের গৃহ ক্ষণভঙ্গুর;—সাধুলোকের গৃহ সুদৃঢ় পাষাণের উপর বিনির্ম্মিত;—বৃষ্টি হউক, বন্যা হউক, ঝড় হউক, কিছুতেই সে গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে না;—কারণ সে গৃহ অটল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

সম্পূর্ণ